দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি, নাগরিক উদ্বেগ ও করণীয়

'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' (৪ এপ্রিল, ২০১৩)

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আজ এক চরম সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে নিপতিত। একের পর এক হরতাল, চারদিকে অবিশ্বাস্য ধরনের সহিংসতা ও নাশকতা, ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তিদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ এবং এর বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলামের লংমার্চের ঘোষণা, সংখ্যালঘূদের ওপর হামলা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আলোচনার টেবিলে বসতে অনীহা ইত্যাদি আমাদের জন্য এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতি জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্যই শুধু ভয়াবহ হুমকি সৃষ্টি করছে না, এটি আমাদের অর্থনীতিকেও পঙ্গু করে দিতে পারে। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় যে, বিরাজমান সংঘাতময় অবস্থা অব্যাহত থাকলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে, এমনকি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিই একটি জঙ্গী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

আজকের সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল আমাদের উদ্বেগ বাংলাদেশের জনগণের সামনে তুলে ধরা। একই সঙ্গে বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তাদের করণীয় সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সাংবাদিক বন্ধুদের, আপনাদের উপস্থিতি ও সহায়তার জন্য, অনেক ধন্যবাদ।

যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে জামাত-শিবির প্রায় সারাদেশে এক ধরনের তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলছে। পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রতিক চরম সহিংস আচরণ যে কোনো বিবেকবান মানুষকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ না করে পারে না। নিঃসন্দেহে তাদের এ আচরণের উদ্দেশ্য যুদ্ধাপরাধের বিচারকে ভণ্ডুল করা। কিন্তু জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ বিচার সম্পন্ন করার কোনো বিকল্প নেই। আমরা জামাত-শিবিরের সহিংস ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের নিন্দা জানাই এবং একই সঙ্গে আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করি।

সন্ত্রাসী ও সহিংস কার্যক্রম বন্ধ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও তৎপর হতে হবে। ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার আগেই গোয়েন্দা বাহিনীকে সম্ভাব্য সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ ধরনের 'প্রিভেনটিভ' পদক্ষেপ নিতে সরকার সফলতা দেখাতে পারে নি। এছাড়াও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া তো দূরের কথা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে পারছে না। উপরন্তু ইতোমধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে গ্রেফতার বাণিজ্যেরও অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করার জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। দুর্বল ট্রেনিং,অযোগ্যতা-অদক্ষতা, দলীয়করণ এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ব্যবহার, অপর্যাপ্ত বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা, নিয়োগে দুর্নীতি, নানা অপকর্মে জড়িত হওয়ার কারণে দুর্বল নৈতিক অবস্থান ইত্যাদি এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী কিনা, তা নিরুপণ করে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

গত মাস খানেকের সহিংসতায় ১৩৭ জন মানুষ মারা গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যার মধ্যে অন্তত ৯ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। এসব মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭০ জন নিরাপরাধ সাধারণ মানুষও রয়েছেন (যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০১৩)। দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতিতে কোনো কোনে ক্ষেত্রে পুলিশের বাড়াবাড়ির এবং অকারণে তাদের বিরুদ্ধে গুলি বর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ একটি প্রশিক্ষিত বাহিনী এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ধৈর্য এবং পেশাদারিত্ব প্রদর্শনের জন্য। আমরা মনে করি যে, যেসব ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে সেগুলো সম্পর্কেও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক, যার জোর দাবি আমরা উত্থাপন করছি।

সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘূদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর কারা ধর্মীয় সংখ্যালঘূদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে তা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। সরকার জামাত-শিবির ও বিএনপিকে এজন্য দায়ী করলেও, বিভিন্ন মিডিয়ার রিপোর্টে এসব কর্মকাণ্ডে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সম্পৃক্ততারও অভিযোগ উঠেছে। এনিয়েও একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার এবং দোষী ব্যাক্তিদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া জরুরী। দ্রুত এ বিষয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই। প্রসঙ্গত, পারস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে রামুর ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার পরিবর্তে সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদেরকে শাস্তি দেওয়া হলে সাম্প্রতিক ঘটনায় জড়িত কিছু দুস্কৃতিকারী হয়তো বা নিরুৎসাহী হত!

গত কয়েক বছর থেকে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি আন্দোলন করতে চাইলে সরকার বিভিন্ন ধরনের দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও অন্যান্য নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং তাঁদেরকে জেলে প্রেরণ করা হয়। এমনকি বিএনপি যুদ্ধাপরাধের বিচার বানচাল করার জন্য আন্দোলন করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। সম্প্রতি প্রায় দেড় শ' বিএনপি নেতা-কর্মীকে পুলিশ দলীয় কার্যালয় থেকে গ্রেফতার করে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তাদের রিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। ডাণ্ডা-বেড়ী পরানো অবস্থায় তাদেরকে আদালতে দেখা গেলেও, আদালত সে ব্যাপারে কিছু না বলে তাদেরকে জামিন দিতে অস্বীকার করে

রিমাণ্ডে পাঠান। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তথা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমাধান না করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়ন করলে এতে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং তা অমঙ্গল বয়ে আনে।

আমরা আমাদের সরকার ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করি। তবে একদল দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। ব্যাক্তি বা দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র কায়েম হয় না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও সরকারের অংশ (প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০০৯)। তাই বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হলে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আর বিরোধী দলকে দমন-পীড়ন স্বৈরতান্ত্রিক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ।

দুর্ভাগ্যতবশত আমাদের রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে নি। আমাদের প্রধান দুটি দল একে অপরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের পরিবর্তে 'শত্রু' ভাবে এবং একদল অপর দলকে 'নিশ্চিহ্ন' করতে বদ্ধপরিকর। ক্ষমতায় গিয়ে পাঁচ বছরের জন্য দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের 'রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ এবং ক্ষমতার বাইরে থেকে দমন-পীড়ন এড়ানোই এ ধরনের ক্ষমতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কারণ। তাই আমাদের দেশে যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়ার অশুভ প্রতিযোগিতা বিরাজমান, যা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর ও অস্থিতিশীল করে ফেলেছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হওয়ার পর থেকে বিরোধী দলের যে কোনো প্রতিবাদকে সরকারি দলের পক্ষ থেকে এ বিচার বন্ধ করার পাঁয়তারা বলে আখ্যায়িত করার অশুভ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কোনো কোনো মহল যেন বিএনপির 'জামায়াতিকীকরণের' লক্ষ্যে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছে। বিএনপি নিজেও যেন এতে সাগ্রহ সায় দিচ্ছে এবং জামায়াতের যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধের এজেণ্ডা বাস্তবায়নে পরোক্ষভাবে হলেও সহায়তা করছে। আমাদের আশঙ্কা যে, বিএনপির জামায়াতিকীকরণ আমাদের জন্য চরম অমঙ্গল ডেকে আনবে। কারণ উগ্রবাদের তপ্ত নিঃশ্বাস আমাদের ঘাড়ে এরই মধ্যের আমরা অনুভব করছি। এই অপশক্তিকে ঠেকাতে হলে আওয়ামী লীগ-বিএনপি এবং সকল প্রগতিশীল শক্তির যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। আর বিএনপি জামায়াতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলে উগ্রবাদকে ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আমাদের আশঙ্কা।

তাই আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা হওয়া জরুরি। জরুরি উগ্রবাদকে প্রতিহত করতে তাদের এবং সকল প্রগতিশীল শক্তিরও নাগরিক সমাজের ঐক্যমত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই আমরা জোর দাবি করছি আওয়ামী লীগ-বিএনপি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সংলাপ। যত দ্রুত এ সংলাপ শুরু হয়, ততই আমাদের জন্য মঙ্গলকর।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কিছু ব্লগারের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্ম ইসলামকে অবমাননার এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ধর্মানুভুতিতে আঘাত হানার অভিযোগ উঠেছে। হেফাজতে ইসলাম নামক একটি সংগঠন এর বিরুদ্ধে লংমার্চের ঘোষণা দিয়েছে। এ ধরনের অপচেষ্টায় লিপ্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে, যার মাধ্যমে সরকার হেফাজতের দাবী বহুলাংশে মেনে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে সরকার হেফাজতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইস্যুরটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় হেফাজতের পূর্ব ঘোষিত লংমার্চ কর্মসূচি প্রত্যাহারের আমরা অনুরোধ জানাই, কারণ লংমার্চকে কেন্দ্র করে আরও সহিংসতা ও নাশকতার আশঙ্কায় আমরা শঙ্কিত। একই সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বন্ধ ও হানাহানি এড়াতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ কয়েকটি সংগঠনের ডাকা আগামী শুক্র ও শনিবারের হরতালও প্রত্যাহারের আমরা আহবান জানাই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বিশেষভাবে আশ্বস্ত বোধ করব সরকার যদি হেফাজতে ইসলামের পাশাপাশি বিএনপিসহ অন্যান্য প্রগতিশীল দল ও ব্যাক্তির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছার উদ্যোগ নেয়। তবে এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া সমীচীন হবে না যাতে মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র কোনোভাবেই সঙ্কুচিত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত, জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত এবং উগ্রবাদ উজ্জীবিত হয়।